কালের কণ্ঠ
ডিসেম্বর ১২, ২০১০
পৃষ্ঠা — ১৭
শ্রেণীসংখ্যা — 070.408

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▸ কালের কণ্ঠ ৩১.১২.১০ পৃষ্ঠা — ১৭

স্ট্রোক ও হৃদরোগ কেন মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ছে-২

হৃদরোগ হলে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি এর প্রতিকারে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। হৃদরোগ একক রোগ নয়। অনেক জটিল কারণে এর উৎপত্তি। হৃদরোগ খুব সূক্ষ্ম ও জটিল বলে এর কারণ নির্ণয় ও উৎকৃষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও বিকাশের ফলে রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। তার পরও হৃদরোগীদের সব সময় নিয়মতান্ত্রিক ও সতর্কতামূলক জীবনযাপন বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চ রক্তচাপকে সাইলেন্ট কিলার হিসেবে গণ্য করা হয়

(গত শুক্রবারের পর)

ইতিপূর্বে বলেছি, হৃদরোগ প্রতিকারে ২০ বছরে বিভিন্ন কার্যকর ওষুধ আবিষ্কারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন প্রতিকারে বাইপাস সার্জারি বিশ্বজুড়ে সাফল্যজনক চিকিৎসা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। রোগ হয়ে গেলে সুস্থতা বা জীবনরক্ষার জন্য আমাদের প্রতিকার খুঁজতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও রোগ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চিকিৎসা সব সময় সুফল বয়ে আনে না। তাই প্রতিকারের চেয়ে রোগ বা রোগের কারণগুলো প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করাই চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। তবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই, রোগ বা রোগের কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সব রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। কারণ বহু রোগের উৎপত্তি অজানা কারণে হয়ে থাকে। ওপরের আলোচনায় হৃদরোগ সৃষ্টির কিছু কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এবার দেখা যাক, আমাদের লাইফস্টাইল ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদরোগ ও তার কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে আমরা কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পারি।

এক. উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ও মৃত্যুর অন্যতম কারণ। আপনি কি জানেন, আপনার রক্তের চাপ স্বাভাবিক আছে কি না? রক্তচাপ স্বাভাবিক না হলে কত বেশি? এসব তথ্য না জানলে বিলম্ব না করে জেনে নিন এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে সচেষ্ট হোন। লাইফস্টাইল, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও ব্যায়ামের মাধ্যমেও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। প্রাকৃতিক উপায়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা গেলে ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়।

দুই. আপনি হৃদরোগে ভুগলে ধূমপান পরিহার করুন। ধূমপান রক্তচাপের জন্য ক্ষতিকর। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে সিগারেটের নিকোটিন রক্তের শিরা বা উপশিরার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তবে এটা জোর দিয়ে বলা যাবে না, শুধু ধূমপান পরিহার করলে রক্তচাপ কমে যাবে বা হৃদরোগ ভালো হয়ে যাবে।

তিন. শরীরের ওজন ঠিক রাখুন। শরীরের মাত্রাতিরিক্ত ওজনের সঙ্গে হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আপনি যদি স্থূলকায় হয়ে থাকেন, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে শরীরের ওজন কমিয়ে আনুন। বাড়তি ওজন কমিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। শরীরের ওজন কমানোর জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করুন।

চার. সুস্থ শরীরের জন্য খাবারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর খাবার স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের জন্য অপরিহার্য। খাবার হতে হবে কম ক্যালরিযুক্ত এবং বেশি পুষ্টিসমৃদ্ধ। জৈব খাবার শরীরের জন্য বিশেষ উপকারী। জৈব খাদ্য বলতে ওইসব খাদ্যকে বোঝায়, যা কীটনাশক ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ছাড়াই উৎপাদন করা হয়। আমাদের খাবারে কম করে হলেও অর্ধেক হতে হবে জৈব শাকসবজি ও ফলমূল। বাকি খাদ্যের মধ্যে থাকতে হবে অর্গানিক ভূমিসমৃদ্ধ শস্য, বাদাম, বিভিন্ন ধরনের বিচি ও তেল, সালাদ হতে হবে খাবারের একটি অপরিহার্য অংশ। কিছু সালাদে বাটার, ক্রিম ও অন্য চর্বি-জাতীয় ড্রেসিং যোগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। পরিশোধিত বা পরিমার্জিত শর্করা, চিনি, সাদা রুটি, ময়দা, পেস্তা, কেক, কুকিজ, পিজা ও প্যাস্ট্রি বর্জন করে অঙ্কুরিত ও সম্পূর্ণ পেস্তা বা আটা (অর্থাৎ যে ভাঙানো গম থেকে কিছুই ঝেড়ে বা ছেঁটে ফেলা হয়নি) খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। খাসি ও গরুর গোশত কম খেতে হবে। পারলে একদম বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রোটিনের উৎস হিসেবে মাছ ও মুরগির গোশত উৎকৃষ্ট। পশুর চর্বি বর্জনীয়। ট্রান্সফ্যাট হৃদরোগ সৃষ্টির সহায়ক। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড শরীরের জন্য বিশেষ উপকারী। কাঁচা লবণ খাওয়া ছেড়ে দেওয়া দরকার। অর্গানিক ডিম, দুধ ও দই স্বাস্থ্যকর খাবার। হৃদরোগীরা দুধের সর খাবেন না। ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন, ভিটামিন ই, সেলেনিয়াম ও পলিফেনল শরীরের জন্য বিশেষ উপকারী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এসব অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের উৎকৃষ্ট উৎস ফলমূল, শাকসবজি ও সবুজ চা। মনে রাখবেন, ওষুধ কম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের চেয়ে প্রাকৃতিক ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট অনেক বেশি কার্যকর ও সস্তা। উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও ক্যান্সার-জাতীয় মারণঘাতী রোগ থেকে বাঁচতে হলে বিয়েশাদি ও অন্যান্য সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে ঘি, বাটার, ডালডা, চর্বি বা প্রচুর তেলসমৃদ্ধ পোলাও, রোস্ট, বিরিয়ানি, খাসি ও গরুর গোশত খাওয়া কমাতে হবে। বিশেষ করে ৪০ থেকে ৪৫ বয়সোর্ধ্ব মানুষের জন্য। আপনার খাবারের তালিকা থেকে জাঙ্কফুডের আধিক্য কমিয়ে আনুন। এসব খাবারে পুষ্টি কম, চর্বি বেশি। এ ছাড়া এসব খাবারে রয়েছে প্রচুর লবণ, চিনি, মনোসোডিয়াম, গ্লুটামেট ও টার্টাজিন-জাতীয় বিতর্কিত খাদ্যোপকরণ। অন্য দরকারি খাবারের মতো জাঙ্কফুডে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও আঁশ কম থাকে। ম্যাকডোনাল্ড, হ্যামবার্গার, ফ্রায়েড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই জাঙ্কফুডের কিছু উদাহরণ। জাঙ্কফুডে প্রচুর চিনি ও চর্বি থাকে বলে এসব খাবার খেলে ওজন বেড়ে যাওয়াসহ উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিসসহ ক্যান্সারের মতো বহু জটিল মারণঘাতী রোগের উৎপত্তি হতে পারে। অনেকের জন্য জাঙ্কফুডের সঙ্গে কোমল পানীয় থাকা চাই। কোমল পানীয়তে প্রচুর চিনি ও ক্যাফেইন থাকে, যার কারণে পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষের শরীরের ওজন বেড়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক হারে। আমাদের সবার মনে রাখা দরকার, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং শরীরের ওপর অত্যাচারের কারণে আমাদের কোনো না কোনো সময় অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি হওয়ার আগেই সাবধান হলে জীবন হবে সুস্থ, সুন্দর ও উপভোগ্য। যা করণীয় তা শুরুতেই শিখতে হবে এবং চর্চা করতে হবে।

পাঁচ. সুস্থ জীবনের জন্য ব্যায়ামের বিকল্প নেই। অলস জীবন মানেই অসংখ্য রোগের আশঙ্কা। হাঁটা হলো সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম। প্রতিদিন দুই মাইল বা তিন কিলোমিটার হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলুন। প্রথম দিকে অল্প দূরত্ব টার্গেট করে হাঁটা শুরু করা দরকার। আস্তে আস্তে দূরত্ব ও হাঁটার গতি এমন পর্যায়ে বাড়াতে উচিত, যাতে হৃৎস্পন্দন বাড়ে। হাঁটার জন্য নরম ও হালকা-পাতলা জুতা ব্যবহার করলে হাঁটতে গতি ও আরাম পাওয়া যায়। বাইরে খোলামেলা জায়গায়, নদীর পাড়ে, গাছপালা ঘেরা পার্ক বা ময়দানে হাঁটলে শরীর-মন দুটিই চাঙ্গা হবে। দূষণমুক্ত বাতাস ও সূর্যের আলোয় হাঁটার উপকারিতা ও আনন্দই আলাদা। হাঁটার সময় সঙ্গী-সাথি নিয়ে আলাপ-আলোচনা, খোশগল্প, হাস্যরস, কৌতুক ও আনন্দ-উল্লাসে অংশ নিন। এতে সারা দিনের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা দূর হবে। ব্যায়াম করলে রাতে ভালো ঘুম হয়। আর ঘুম সুস্বাস্থ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। হাঁটা ছাড়াও সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা অথবা জিমনেসিয়ামে ব্যায়াম করা যেতে পারে। কোন ব্যায়াম কার জন্য কতটুকু উপযোগী, সে বিষয়ে চিকিৎসক পরামর্শ দিতে পারেন।

ছয়. দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করুন। হৃদরোগ নিয়ে বেশি খাটাখাটি করবেন না। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন এবং রাতের ঘুম যে নিরুপদ্রব হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। রাতে ভালো ঘুম না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঘুমের ওষুধ খাবেন। কঠোর ব্যায়াম এবং ঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখার কারণে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত অ্যাড্রেনালিন নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত বেড়ে যায়। হৃদরোগ, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে এ মাত্রাতিরিক্ত হৃৎস্পন্দন তথা অতিমাত্রায় রক্ত প্রবাহের ফলে হার্টফেল করে রোগী তাৎক্ষণিক মারা যেতে পারে। মনে রাখবেন, ব্যায়াম, জ্বর, উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, চা, কফি বা অ্যালকোহল পান, কোনো কোনো ওষুধ সেবন হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধির কারণ।

সাত. সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রাখুন। আমাদের শরীর শুধু রক্ত-মাংসে গড়া কোনো বস্তু নয়। আমাদের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মন বা আত্মা। বস্তুজগতে কাম, ক্রোধ, লোভ, ক্ষোভ, মোহ, মাৎসর্য, অসূয়া বা ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা আমাদের দুঃখকষ্ট, অশান্তি, অসুস্থতা ও ধ্বংসের মূল কারণ। মানুষ তার সততা, সৎকর্ম, অকুণ্ঠ ও অটল সৃষ্টিকর্তাপ্রীতির মাধ্যমে উল্লিখিত বদগুণ থেকে নিজেকে দূরে রেখে এ জীবনেই পরম স্বর্গসুখের স্বাদ লাভ করতে পারে। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে নিয়মতান্ত্রিক, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের আদেশ দিয়েছেন। তার সেই আদেশ-নিষেধ মেনে চললে জীবন অনেক শান্তিময় ও নিরাপদ হয়।

ওপরে বর্ণিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে হৃদরোগের হার কমে যায়। হৃদরোগ হলে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি এর প্রতিকারে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। হৃদরোগ একক রোগ নয়। অনেক জটিল কারণে এর উৎপত্তি। হৃদরোগ খুব সূক্ষ্ম ও জটিল বলে এর কারণ নির্ণয় ও উৎকৃষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও বিকাশের ফলে রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। তার পরও হৃদরোগীদের সব সময় নিয়মতান্ত্রিক ও সতর্কতামূলক জীবনযাপন বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চ রক্তচাপকে সাইলেন্ট কিলার হিসেবে গণ্য করা হয়। চল্লিশোর্ধ্ব সব মানুষের হৃদরোগ সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। মধ্যবয়সী বা বয়স্কদের নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে হার্টের অবস্থা ও কার্যক্রম, রক্তচাপ ও রক্তে এলডিএল, এইচডিএলসহ হৃদরোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য প্যারামিটারগুলো স্বাভাবিক আছে কি না তা জেনে নেওয়া উচিত। এটা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়, অনেক রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে চিকিৎসা বা প্রতিকার অধিক সহজ হয়। অবজ্ঞা, অবহেলা ও সময়মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করায় অনেক সময় হৃদরোগের মতো জটিল রোগগুলোর অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন চিকিৎসকের বেশি কিছু করার থাকে না। সুতরাং সময় থাকতেই আপনার হৃদরোগ আছে কি না, থাকলে কোন পর্যায়ে, তা জানা এবং তার সঠিক চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। চিকিৎসকের পরামর্শ হুবহু মেনে চলুন এবং দুশ্চিন্তামুক্ত নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করুন। দেখবেন, হৃদরোগ নিয়েও আপনার জীবন অনেক সহজ ও সুন্দর হবে।

(সমাপ্ত)

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওষুধ ও জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষক